উত্তরবঙ্গের রাজবংশী
সমাজ ও রাজনীতি

বিমল চন্দ্র বর্মণ

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

শৃংখলা সম্পাদকের কথা ৯

ভূমিকা ১৯

প্রথম অধ্যায়
রাজবংশী জাতির আত্মপরিচিতি ৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ১০৯

তৃতীয় অধ্যায়
'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' ও উত্তরবঙ্গের ইতিহাস অনুসন্ধান ১৩১

চতুর্থ অধ্যায়
পঞ্চানন বর্মা ও ক্ষত্রিয় সমিতি ১৭০

পঞ্চম অধ্যায়
স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে রাজবংশীদের রাজনৈতিক অবস্থান ১৮৭

উপসংহার ২১৭

সহায়ক পত্র পত্রিকা এবং গ্রন্থসমূহ ২২৭

শৃংখলা সম্পাদকের কথা

অনেক দিন আগের কথা। তখনও পশ্চিমবাংলার শাসনকেন্দ্র ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে নব-নামাংকিত 'নবান্ন' ভবনে স্থানান্তরিত হতে বছর পাঁচেক বাকি। যতদূর মনে পড়ছে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থান বিষয়ে একটা গবেষণার কাজে কোচবিহার জেলার কিছু গ্রামে যেতে হয়েছিল। গবেষণার কাজটা আমরা পুরো করতে পারিনি, কিন্তু সেই সূত্রে শীতলকুচি, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উঠে এসেছিল এক ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে সামাজিক বিন্যাস ও ভূগোলের যোগে ঘটে চলছিল মানবিক সত্তার নিরন্তর অবদমন। শাসনের কেন্দ্র কলকাতা থেকে এই অঞ্চল ভৌগোলিকভাবে প্রান্তিক। আবার এই অঞ্চলের বাসিন্দা, রাজবংশী এবং অন্যান্য অ-ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠীর লোকেরা, সামাজিকভাবেও প্রান্তিক। ভারতীয় সমাজের অন্যতম প্রধান বিভাজক জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় এঁদের অবস্থান একেবারে নীচের দিকের সোপানে। বিপরীতে, বাংলার শাসনক্ষমতায় মোটামুটিভাবে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার সবচেয়ে ওপরের ধাপটির নিরঙ্কুশ অধিকার।

সেই অধিকারে সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র কিন্তু মহাশক্তিধর শাসকীয় গোষ্ঠীর 'বাঙালি' পরিচিতিটিই চেপে বসে বাংলার ব্যাপক ভূগোল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানান লোকসামাজিক বৈচিত্রের ওপর।

তখন, রাজবংশী অধ্যুষিত সেই অঞ্চলের কী সাবেক শাসকদলের সদস্য, কী বিরোধী দলের সমর্থক, প্রায় সকলের বাক্যে ছিল একদিকে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভবের গ্লানি, অন্যদিকে সেই লজ্জা থেকে মুক্ত হবার যুদ্ধ—প্রতিশ্রুতি। তার কিছু কাল পূর্বেই, ১৯৯০ দশক থেকে শুরু করে নতুন সহস্রাব্দের কয়েক বছর জুড়ে, আত্মমর্যাদার দাবিকে অবলম্বন করে এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল সশস্ত্র যুদ্ধ। সেনাবাহিনী ও পুলিশ তাকে দমন করেছে। কিন্তু, মানুষের মন থেকে যুযুৎসা নির্মূল হয়নি, বেশিরভাগ মানুষই সশস্ত্র পথের বিরোধী ছিলেন, আলাদা রাজ্যের পক্ষেও ব্যাপক মানুষের সমর্থন ছিল না, কিন্তু ভৌগোলিক ও সামাজিক অবদমনের বিরুদ্ধে ভিন্ন পথে সংগঠিত হবার যাবতীয় রসদ মজুত ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই সাবেক শাসকদের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নতুন শাসক বেছে নেওয়াটাও ছিল একটা সমর কৌশল। সেই কৌশল কতটা যথার্থ, কতটা ফলপ্রসূ, তা নিয়ে ভাববার যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু, সে-প্রশ্নের চেয়ে বড়ো ব্যাপার হল, এত মানুষ এত তিক্ততা ও ক্রোধ নিয়ে, অবদলিত আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করে চলেছেন, অথচ বাংলার তথাকথিত মূলধারার বিদ্যাচর্চা এ-ব্যাপারে এতটা অনাগ্রহী কীভাবে হতে পারে? মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, তাঁদের ওপর ঘটে চলা নানাবিধ অত্যাচার, তাঁদের

শ্রমের লুণ্ঠন, ইত্যাদি নিয়ে যে বাঙালি গড়ে তুলেছে মুদ্রিত বিদ্যাচর্চার বিপুল সম্ভার, সেই বাঙালি কীভাবে এতটা নির্লিপ্ত থাকতে পারে এক অংশের সহনাগরিকদের প্রতি?

অবশ্য এই নির্লিপ্ত দূর করার প্রয়াস একেবারেই দেখা যায়নি তা নয়; বাস্তবিকই এর একটা জোরালো চেষ্টা দেখা গিয়েছিল ১৯৮০-র দশকে শুরু হওয়া নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা-র মধ্যে। যে-কোনো কারণেই হোক সেই চর্চা বিদ্যায়তনিক সীমানা ছাড়িয়ে লোকসাধারণের কাছে পৌঁছবার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। দোষটা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার নয়, সেই ঘাটতি নিহিত বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক বিন্যাসে চিরাচরিতভাবে চলে আসা কাঠামোগত কেন্দ্রীকরণের মধ্যে। কাঠামোটা হল, সমাজের বিশেষ কুলে জন্মানো লোকেরা বিশেষ বোঝা বয়ে যাবে, আর অন্য দল, সমাজের যাবৎ উৎপন্ন আত্মসাৎ করে চলবে। নিয়মটাকে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষমতাধররা প্রকৃতিনির্দিষ্ট বলে মেনে এসেছে, তা সংবিধানে যতই রক্ষাকবচ দেওয়া থাক। যে উৎপাদন-ব্যবস্থার কারণে সমাজে শ্রেণি-বিভাজন ঘটে, এক শ্রেণি অন্য শ্রেণির শ্রম শোষণ করে বিত্তবান ও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে, ভারতীয় সমাজে সেই উৎপাদন-ব্যবস্থাটি জাতিভেদ-সহ বিভিন্ন প্রান্তিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কে কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণিতে থাকবে তা অনেকাংশেই নির্ভরশীল হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি কোন জাতিতে বা কোন পরিচিতি গোষ্ঠীতে জন্মেছে তার ওপর। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেলেও ভারতবর্ষের সমাজ এই পরিচিতিগত বন্ধন থেকে যে মুক্তি পায়নি তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, এখনও উৎপাদন